

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: সম্ভাবনা, সংকট ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আমাদের সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী প্রযুক্তিতে পরিণত হচ্ছে। এআই মানবসভ্যতার সামনে অভূতপূর্ব সম্ভাবনা ও গভীর উদ্বেগ একসঙ্গে নিয়ে এসেছে। তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণা, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং উৎপাদনব্যবস্থায় এর ব্যবহার মানুষের জীবন সহজ ও সমৃদ্ধ করতে পারে। একইসঙ্গে কর্মসংস্থান সংকোচন, বৈষম্য বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন, অপতথ্যের বিস্তার এবং জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করেছে। তাই এআইয়ের অগ্রগতি কত দ্রুত হচ্ছে, এর পাশাপাশি এ অগ্রগতি কতটা নিরাপদ, জবাবদিহিমূলক ও মানবকল্যাণমুখী—সেটিও বিবেচনা করতে হবে। সমাজ কতটা ঝুঁকি গ্রহণ করবে, সেই সিদ্ধান্ত কেবল প্রযুক্তি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। একাই কয়েক দশকের গবেষণার ফল হলেও সাম্প্রতিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য হলো—মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে এর ব্যাপক প্রবেশ। অতীতে যন্ত্র প্রধানত শারীরিক শ্রম ও পুনরাবৃত্তিমূলক শিল্পকাজ সহজ করেছে। আধুনিক এআই এখন নথি তৈরি, অনুবাদ, কম্পিউটারের কোড লেখা, ছবি নির্মাণ এবং বিশ্লেষণধর্মী কাজও করেছে। ফলে কারখানার পাশাপাশি অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যম ও জনপ্রশাসনেও পরিবর্তন আসছে। এ রূপান্তরের ব্যাপকতা ও গতি সমাজের বানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতাকে পরীক্ষার মুখে ফেলেছে।

স্বাস্থ্যসেবায় যথাযথভাবে পরীক্ষিত এআই রোগ নির্ণয়ে সহায়তা, গবেষণা ত্বরান্বিত এবং চিকিৎসকদের প্রশাসনিক চাপ কমাতে পারে। জনবলের ঘাটতি রয়েছে এমন এলাকায় স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যগুণ্ডিও সহজ করতে পারে। তবে ভুল পরামর্শ, রোগীর তথ্য ফাঁস এবং যন্ত্রের ওপর অতিনির্ভরতা বিপজ্জনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এসব সম্ভাবনার পাশাপাশি

নিরাপত্তা ও নৈতিক তত্ত্বাবধানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। চিকিৎসার সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব যোগ্য মানুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। শিক্ষায় এআই শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা, ভাষাশিক্ষা এবং শিক্ষকদের উপকরণ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে। বাংলাদেশের মতো দেশে বাংলাভিত্তিক সাশ্রয়ী প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে পারে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও অনুশীলনের পরিবর্তে তৈরি উত্তরের ওপর নির্ভর করলে তাদের যুক্তিবোধ ও সৃজনশীলতা দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। প্রযুক্তির সাফল্য বিচার করতে হবে শিক্ষার্থী কতটা বুঝছে এবং কতটা স্বাধীনভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারছে, তার ভিত্তিতে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বাস্তব প্রমাণও রয়েছে। গ্রাহকসেবায় নিয়োজিত ৫ হাজার ১৭৯ জন কর্মীর ওপর গবেষণায় এআই-সহায়ক ব্যবহারের ফলে ঘণ্টাপ্রতি সমস্যা সমাধান গড়ে প্রায় ১৪ শতাংশ বেড়েছিল। কম অভিজ্ঞ কর্মীরা বেশি উপকৃত হয়েছিলেন। তবে একটি ক্ষেত্রের ফল সব প্রতিষ্ঠানের জন্য সমান সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়। উপযুক্ত কাজ নির্বাচন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং ভুল সনাক্ত করার সক্ষমতা অপরিহার্য। কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কম মানুষ দিয়ে সমপরিমাণ কাজ করা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়োগ কমাতে, চুক্তিভিত্তিক কাজ সংকুচিত করতে অথবা কর্মী ছাঁটাই করতে পারে। তবে সব ছাঁটাইয়ের কারণ এআই নয়; ব্যবসায়িক পুনর্গঠন, চাহিদা হ্রাস ও অতিরিক্ত নিয়োগও ভূমিকা রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ২০২৫ সালের মূল্যায়নে বিশ্বে প্রায় প্রতি চারটি চাকরির একটি জেনারেটিভ এআইয়ের প্রভাবে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। এর অর্থ এক-চতুর্থাংশ কর্মী চাকরি হারাবেন—এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপনের চেয়ে কাজের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনাই বেশি।

বিশেষ উদ্বোধনের বিষয় হলো, নবীনদের কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ কমে যাওয়া। জুনিয়র প্রোগ্রামার, অনুবাদক ও বিশ্লেষকরা সাধারণ কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেসব কাজ যন্ত্রের হাতে চলে গেলে ভবিষ্যতে দক্ষ জনবল তৈরির পথ সংকুচিত হতে পারে। প্রযুক্তি নতুন পেশা সৃষ্টি করলেও চাকরিচ্যুত সবাই দ্রুত সেই কাজে যোগ দিতে পারবেন না। পরিবারের জীবিকা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখা যায় না। উৎপাদনশীলতার সুফল শুধু মালিক ও শেয়ারহোল্ডারদের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে বৈষম্য ও সামাজিক অসন্তোষ বাড়াতে পারে। ক্লডের নির্মাতা অ্যানথ্রোপিকের গবেষকের পদত্যাগসংক্রান্ত ঘটনাটিও সতর্কভাবে বিবেচনা করা দরকার। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের সংবাদ অনুযায়ী, গবেষক জ্যাকব কক্সন পদত্যাগ করে কোম্পানিগুলো দায়িত্বহীন ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের সক্ষমতা বাড়াতে পারে—এমন অতিবুদ্ধিমান এআই তৈরির প্রতিযোগিতা নিয়ে উদ্বেগ জানান। তবে আগামী দশ বছরে মানবজাতির বিলুপ্তির আশঙ্কা ১০ শতাংশের বেশি—এ নির্দিষ্ট মূল্যায়নটি আরেক গবেষক ইভান হুবলিঙ্গারের। এগুলো গুরুতর ব্যক্তিগত মূল্যায়ন, প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস নয়।

এ ধরনের সতর্কতা উপেক্ষা করা উচিত নয়, আবার বিপর্যয় অনিবার্য বলাও যথার্থ নয়। আন্তর্জাতিক এআই নিরাপত্তা প্রতিবেদন ২০২৬ অনুযায়ী, ভবিষ্যতে মানুষের নিয়ন্ত্রণ হারানোর চরম পরিস্থিতির আশঙ্কার চেয়ে বর্তমানে প্রতারণা, অপতথ্য ও ভুল তথ্যের ক্ষতির ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। অনিশ্চয়তা সম্পর্কে সৎ থাকাও জরুরি। ভবিষ্যতের আশঙ্কা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমানে প্রতারণা, অপতথ্য ও ভুল সিদ্ধান্তের ক্ষতি আড়াল করা চলবে না। এআই দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যা, নকল কণ্ঠ ও জাল ছবি তৈরি জনআস্থা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এসব উপকরণ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, রাজনৈতিক বিভ্রান্তি কিংবা আর্থিক প্রতারণায় ব্যবহৃত হতে পারে। এআইকে গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার ও অবকাঠামো পরিচালনার অধিক সুযোগ দিলে ভুল হতে পারে

বা অপব্যবহারের ক্ষতি বাড়তে পারে। সরকারি যোগাযোগের সত্যতা যাচাই, দ্রুত অপতথ্য সংশোধন এবং নাগরিকদের তথ্য সুরক্ষা জরুরি। প্রাণঘাতী সামরিক সিদ্ধান্ত কার্যকর মানবিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হবে। নিরাপত্তার অজুহাতে সীমাহীন নজরদারিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

পরিবেশগত মূল্যও বিবেচ্য। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার ২০২৫ সালের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ডেটা সেন্টারের বৈশ্বিক বিদ্যুৎ ব্যবহার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে প্রায় ৯৫০ টেরাওয়াট-ঘণ্টা হতে পারে। এআই এ বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। সংখ্যাটি সব ডেটা সেন্টারের, শুধু এআইয়ের নয়। তাই বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবহার, স্থানীয় অবকাঠামোর চাপ এবং জ্বালানি দক্ষতার স্বচ্ছ মূল্যায়ন প্রয়োজন। করণীয় হলো ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। চিঠি সম্পাদনার প্রযুক্তি এবং হাসপাতাল, শিল্পকারখানা বা সামরিক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত এআইয়ের জন্য একই নিয়ম যথেষ্ট নয়। উচ্চঝুঁকির ব্যবস্থায় স্বাধীন পরীক্ষা, সীমাবদ্ধতা প্রকাশ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং স্পষ্ট জবাবদিহি থাকা উচিত। গুরুতর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ব্যবহার স্থগিত করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রকের থাকতে হবে। নিরাপত্তার ব্যর্থতা প্রকাশকারী কর্মীদের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে।

প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে বাজার দখলের তাড়না এবং অনিরাপদ সম্প্রসারণে সংযম দেখাতে হবে। বিপজ্জনক সক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থা উন্মুক্ত করার আগে পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদর্শনের দায় তাদের। তবে নিয়ন্ত্রণ এত ব্যয়বহুল হওয়া উচিত নয় যাতে শুধু বৃহৎ কর্পোরেশন টিকে থাকে। স্বাধীন গবেষণা ও ছোট উদ্ভাবকদের সুযোগ নিশ্চিত করা দরকার। কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা, পুনর্সংগঠন, বিকল্প দায়িত্বে নিয়োগ এবং বেকারকালীন সহায়তাকে প্রযুক্তি গ্রহণের অংশ করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বাড়লে

উন্নত মজুরি, কম কর্মঘণ্টা বা মুনাফায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুফল ভাগ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার হওয়া উচিত মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, বাংলাভিত্তিক তথ্যসম্পদ, সাইবার নিরাপত্তা এবং বিদেশি প্রযুক্তি মূল্যায়নের সক্ষমতা। সরকারি ব্যবহারে পরিমাপযোগ্য সুফল ও নাগরিকদের অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগ্নি নিরাপত্তা, গুরুতর ঘটনার তথ্য বিনিময় এবং বিপজ্জনক ব্যবহারে যাচাইযোগ্য বিধিনিষেধ প্রয়োজন। এসব সিদ্ধান্তে উন্নয়নশীল দেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এআইয়ের সাফল্য পরিমাপ করতে হবে মানুষ কতটা নিরাপদ, সক্ষম ও সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং নিজের ভবিষ্যতের ওপর কতটা কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারছে, তার ভিত্তিতে।

এআই কীভাবে বিকশিত হবে এবং এর সুফল কীভাবে বণ্টিত হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ এখনো মানুষের হাতে রয়েছে। আজকের সিদ্ধান্তগুলো নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে—এ প্রযুক্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও উৎপাদনশীল কাজকে শক্তিশালী করবে, নাকি নিরাপত্তাহীনতা, পরনির্ভরতা ও বৈষম্য বাড়াবে। দায়িত্বশীল সংযম বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাফল্যের মানদণ্ড হওয়া উচিত মানুষ কতটা নিরাপদ, সক্ষম ও সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং নিজের জীবনকে প্রভাবিত করা প্রযুক্তির ওপর কতটা কার্যকর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারছে।

লেখকঃ মেজর জেনারেল এইচআরএম রোকন উদ্দিন (অব.), নিরাপত্তা বিশ্লেষক।